দৈনিক
ইনকিলাব

12 JUL 2008

নিরক্ষরতা দূরীকরণে সম্ভাবনাময় কার্যক্রম

মসজিদভিত্তিক শিক্ষা

মাহমুদ জামাল

॥ শেষ কিস্তি ॥

মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের অতীত-বর্তমান

১৯৯২ সালে 'মসজিদভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম' শীর্ষক ৫৯৯.৩২ লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৯৩ শিক্ষাবর্ষে ১টি করে উপজেলায় ১২টি করে চার স্তরবিশিষ্ট শিক্ষার আওতায় সারাদেশে ৭৬৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৪,৯৬০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করা হয়। প্রকল্প মেয়াদে (মে ১৯৯২-জুন ১৯৯৫) মোট লক্ষ্যমাত্রা ৭৪,৮৮০ জনের স্থলে তিন বছরে ৯৪,৫৯০ জনকে শিক্ষাদান সম্ভব হয় যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১৯,৭১০ জন (২৬.৩২%) বেশি।

প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের এই সাফল্যের কারণে দ্বিতীয় মেয়াদে (জুলাই ১৯৯৫-জুন ২০০০) ৪,৮০০টি কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বাস্তবে ৮,০০০ শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬,১১,৫২০ জনের স্থলে ৬,৮৩,৫২০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর দান করা হয় যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১২%বেশি। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় প্রায় সাতগুণ সম্প্রসারণ করে ৩৭.৫০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্পের ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা এবং সাফল্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত।

এমন ধারাবাহিক সাফল্যের প্রেক্ষিতে সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, আন্তমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং আন্তমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি সম্প্রসারণে সুপারিশ করে। ফলে তৃতীয় পর্যায়ে (জুলাই ২০০০-জুন ২০০৫)-এর পরিধি ও লক্ষ্যমাত্রা আরও কয়েকগুণে বৃদ্ধি পায় এবং ৯৪.৭৯ কোটি টাকায় বছরে ১২ হাজার শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৬,০৩,৬০০ জনকে শিক্ষাদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু অগ্রগতির ধারা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় ১০০১%। এই মেয়াদে ৫১২টি জীবনব্যাপী পাঠাগারের সাথে উপজেলা পর্যায়ে ১৯২টি মডেল লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়। তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত (২০০৫) মোট ২৪,২১,১৫০ জনকে শিক্ষা দেয়া হয় যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৪.৩৬% বেশি।

এই ধারাবাহিকতার ফলেই উত্তরোত্তর এ প্রকল্পের কেন্দ্র, আর্থিক বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে শিপ ওভার ব্যবস্থার মাধ্যমে সারাদেশে ১৮ হাজার মসজিদে এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয় এবং একই সাথে ১২ হাজার কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রও চালু করা হয়। এ পর্যায়ে ২১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯,৩৭,৬০০ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এ পর্যায়ের অতিক্রান্ত একটি বছরে (২০০৭ শিক্ষাবর্ষ)।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

শিক্ষা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ও অগ্রগতির হার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি বিষয় যথাযথভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে ড্রপ আউট ও রিপিটার-এর হার বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ও অগ্রগতির হার বেশ ভালো বিধায় তা এই কার্যক্রমের সাফল্যকে ওপরে তুলে এনেছে। এখনে গড় শিক্ষা অগ্রগতি ও উপস্থিতির হার শতকরা ৯৫ ভাগের ওপরে রয়েছে।

মসজিদভিত্তিক চলমান শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থী পিছু ব্যয় প্রকল্পের সম্পন্নকৃত তৃতীয় পর্যায়ের (২০০১-২০০৫) চূড়ান্ত মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যয় বাদে ৩৮৩ টাকা। চতুর্থ পর্যায়ে এই ব্যয় কিছুটা বেড়ে ৪৬৬/- টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যয় দ্বিগুণেরও বেশি। যেমন বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর শিক্ষার্থী প্রতি ব্যয় ১১০০ টাকা, ঢাকা আহসানিয়া মিশন ১২০০ টাকা।

শুধু ব্যয়ের ক্ষেত্রেই নয় বরং মার্কিন মূল্যায়নেই এই কার্যক্রম অত্যন্ত সফল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ায় অভ্যস্ত ও বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা।

সে অনুযায়ী প্রকল্প কেন্দ্রে এক বছরের কোর্স সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীদের স্কুল-মাদ্রাসাতে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মসজিদভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সমাপনকারী শিক্ষার্থীদের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করার কথা থাকলেও বাস্তবে তারা প্রথম শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে পর্যন্ত ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকে। এর কারণ প্রকল্পের শিক্ষার মান অপেক্ষাকৃত উন্নত বলে এক বছরে যে পাঠদান করা হয় তা অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর সমান মানসম্পন্ন।

এই যে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন বয়সস্তরে শিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী, যাদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছে তাদের বর্তমান অবস্থা কি? অর্থাৎ তারা কি শিক্ষার অবস্থা ধরে রাখতে পেরেছে? যদি তা পেয়ে থাকে তাহলে শ্রেণীকক্ষে তাদের অবস্থান কেমন? আসলে এ ধরনের তেমন কোন পরিসংখ্যান প্রকল্প দপ্তরে রাখা হয়নি। তবে এ ব্যাপারে ছোট একটি স্টাডি থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী একটি জেলায় সংক্ষিপ্ত আকারে জরিপ চালিয়ে দেখা যায় মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম থেকে শিক্ষা শেষ করে শিক্ষার্থীরা প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয় বা এবতেদায়ী মাদরাসায় ভর্তি হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর মান মধ্যম সারির বলে ধারণা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অনেকেই প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

এদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পর রোল নম্বরও অধিকাংশে ক্ষেত্রেই ১ থেকে ৪০-এর মধ্যে রয়েছে। এতক্ষণের আলোচনায় অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে যে, মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিগুলো ইতিবাচক মন্তব্য করেছে। এদের মধ্যে সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, আন্তমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি, আন্তমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি, জাতীয় সংসদের ধর্মমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন কমিটি রয়েছে। এ সকল পর্যায় থেকে প্রকল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণের পক্ষে জোরালো মত ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে হলে সারাদেশের সকল মসজিদে এই কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে হবে। পূর্বে অবকাঠামোগত অসুবিধা থাকলেও বর্তমানে দেশের সকল উপজেলায় রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে সাব-অফিস স্থাপন করা হয়েছে এবং সেখানে ফিল্ড সুপারভাইজার ও কেয়ারটেকার কাজ করছেন। উপজেলা সাব-অফিসগুলোকে পূর্ণাঙ্গ অফিসে রূপান্তর করে সেখানে একজন কর্মকর্তা পদায়ন করা গেলেই ২ লাখ মসজিদে কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা সম্ভব হবে। সরকার এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ভাববেন বলে জাতির প্রত্যাশা।